মৃত্যুঞ্জয়ী মনোরঞ্জন ঘোষাল

সংশপ্তক হাসান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে যখন সম্মুখ সমরে ব্যস্ত তখন গান-কবিতার মাধ্যমে তাদের উজ্জীবিত রাখার কাজটি করেছেন একঝাঁক দেশপ্রমিক সংস্কৃতি কর্মী। সম্মুখ সমরে ব্যস্ত যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিতে যারা নিবেদিত ছিলেন তাদেরই একজন মনোরঞ্জন ঘোষাল। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের একজন শব্দ সৈনিক তিনি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফেরা মনোরঞ্জন ঘোষাল স্বজন হারানোর আর্তনাদ নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন সেখানে।

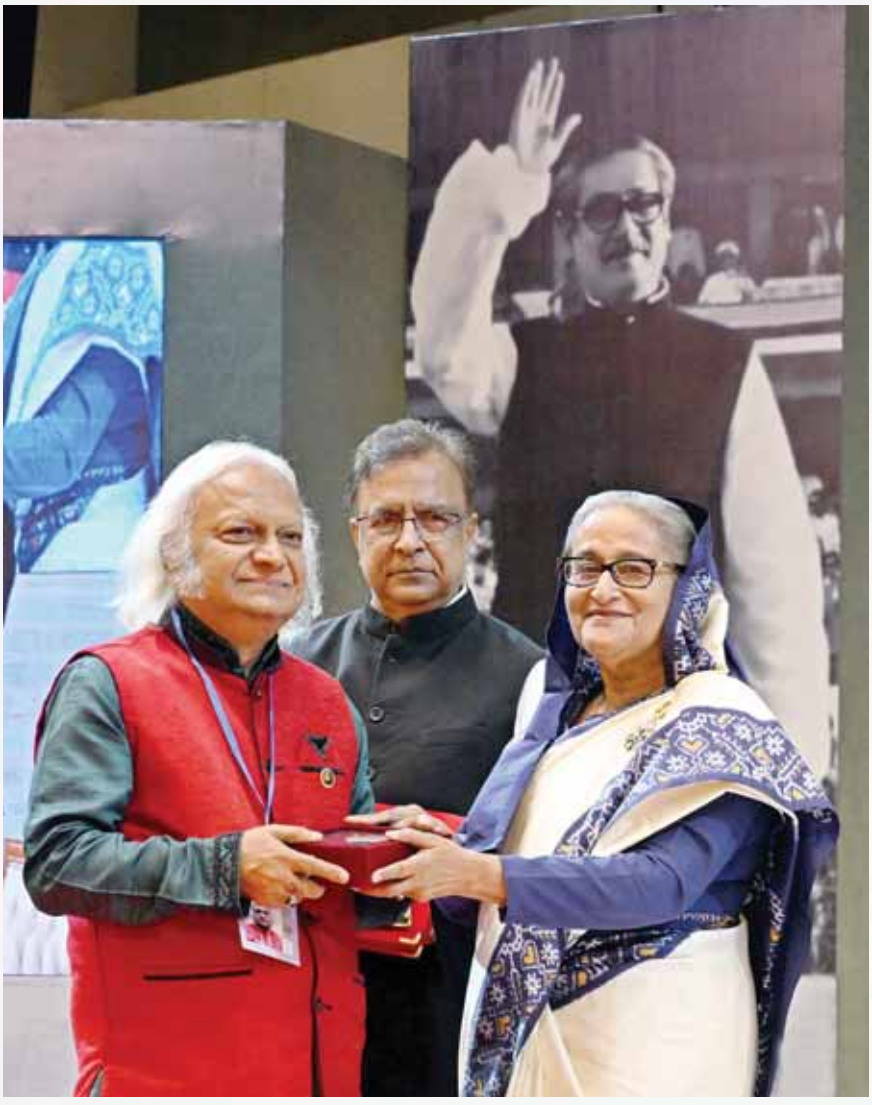

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে 'একুশে পদক ২০২৩' গ্রহণ করেন মনোরঞ্জন ঘোষাল। ছবি: পিআইডি

এই গায়কের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১ মে। তার বাবার নাম যামিনী কান্ত ঘোষাল। মায়ের নাম কমলা ঘোষাল। গানের সঙ্গে সখ্যতা তার ছোটবেলায়। মায়ের কাছেই নিয়েছেন প্রথম পাঠ। গানে গানে বেড়ে উঠেছে তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন। ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিলেন ঘোষাল। পড়ালেখা করেছেন জগন্নাথ কলেজে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে এমকম ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। অল্পবয়স থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন মনোরঞ্জন। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তার। সেসময় আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল বিক্ষুব্ধ শিল্পীগোষ্ঠী। তিনি যোগ দিয়েছিলেন এই বিপ্লবী সংগঠনে। মনোরঞ্জনকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয় ১৯৭১ সালে। হারান দুই ভাইকে। নিজেও ফিরে আসেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে।

মনোরঞ্জনের বাবা ছিলেন প্রকাশনা ব্যবসায়ী। ২৫শে মার্চ কালরাতে শহর জুড়ে যখন পাকিস্তানি সেনাদের নারকীয় উল্লাস চলছিল, মনোরঞ্জন তখন ৪৫ নম্বর পাটুয়াটুলীতে তার বাবার প্রকাশনা সংস্থা ইস্ট পাকিস্তান পাবলিশার্সের দোতলায়। মুহূর্মুহু গুলিতে কাঁপছে শহর। ওই কালরাতে কয়েকবার বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন মনোরঞ্জন। কিন্তু পারেননি। সেসময় তাদের বাসা ছিল ৫১ নম্বর শাঁখারি বাজারে। সকাল হতেই ছুটে যান সেখানে। বাসায় গিয়ে পরিবারের সবাইকে অক্ষত পেলেও জানতে পারেন রাতের আঁধারে ঢাকায় ঘটে গেছে ইতিহাসের সবচেয়ে পাশবিক গণহত্যাগুলোর একটি। খানসেনাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে রাজারবাগের পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, খেটে খাওয়া মানুষ।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে তার বাবার চিন্তা ছিল একটু বেশি। কারণ মনোরঞ্জন যুক্ত ছিলেন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। চারপাশের সবাই এ কথা জানতেন। নিরাপত্তার কথা ভেবে বাসায় থাকার পরিবর্তে পালানোর উপদেশ দিলেন ছেলেকে। মনোরঞ্জনও বুঝতে পারেন, বাবার কথায় যুক্তি আছে। মনোরঞ্জন বাড়ি ছাড়েন অজানার উদ্দেশে। কিন্তু কোথায় যাবেন? বন্ধু কালীদাস থাকতেন ১১ নম্বর গোবিন্দলাল দত্ত লেনে। প্রথমে সেখানেই গেলেন মনোরঞ্জন। কালীদাসের ভাই শান্তিলাল চাকরি করতেন মতিঝিলের কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলে। নিজের অফিসেই নিয়ে যান মনোরঞ্জনকে। পরে সেখান থেকে যান নিশাত জুট মিলে। সে রাত সেখানেই কাটান তিনি। কিন্তু মন পড়ে ছিল বাসায়। কেমন আছে পরিবারের সবাই! ২৭ মার্চ সকালে কারফিউ একটু শিথিল হয়। অমনি বাসার চলে আসেন তিনি। কিন্তু ঘরে ফিরে যে এমন দৃশ্য দেখতে হবে ভাবনায় ছিল না তার। বাসায়

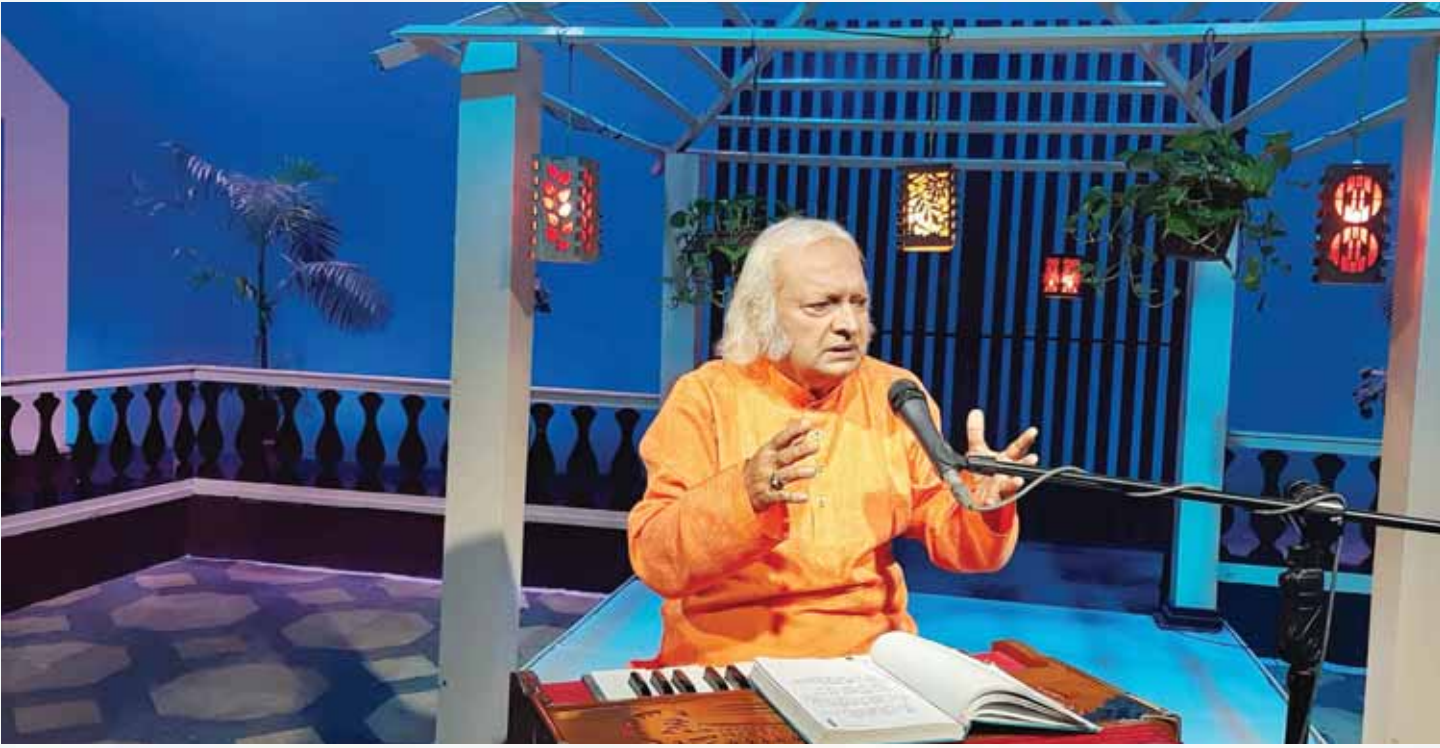

ঢোকার আগেই প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারেন তার বড় ভাই আর নেই। হানাদারদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। স্তব্ধ মনোরঞ্জন বাসায় যান। দেখেন, স্বজন হারানোর যন্ত্রনায় আহাজারি করছেন তার বাবা-মা, বউদি। বাবা তাকে দেখে এগিয়ে আসেন। হাতে কিছু টাকা দিয়ে পালাতে বলেন শহর ছেড়ে। মনোরঞ্জনও আর দেরি করেন না। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে অগ্রজ হারিয়ে বিলাপ করার সময় পাননি তিনি। নিরাপদ স্থানে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে যান মতিঝিলে। পরে সেখান থেকে যান তার পরিচিত এডমন্ড রোজারিওর বাড়ি। পরে আশ্রয় নেন সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। সেখানে প্রাণভয়ে আরও অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ছিলেন বন্ধু কালীদাস ও তার পরিবারও। সব মিলিয়ে ৩৩ জন মানুষ জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই স্কুলে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সেদিন দুপুরের দিকে ওই স্কুলে হানা দেয় দখলদার বাহিনি। মনোরঞ্জনসহ একে একে ৩৩ জনকেই পাকড়াও করে তারা। স্কুলটি গণকবরে পরিণত হতো যদি সেন্ট গ্রেগরির ফাদার হস্তক্ষেপ না করতেন। সৈন্যরা যখন ৩৩ জনকে বেঁধে মেরে ফেলতে যাচ্ছে তখন বাধা দেন ফাদার। বলেন, পবিত্র স্থান স্কুলের ভেতরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটান যাবে না। পাকিস্তানি সেনাদের হুমকি দেন, তার কথা শোনা না হলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে অভিযোগ জানাবেন। এতে কাজ হয়। সেনারা মনোরঞ্জন ঘোষালদের নিয়ে আসে জগন্নাথ কলেজের ভেতরে। নারী-পুরুষ আলাদা করে দুটি কক্ষে মাটিতে ফেলে রাখে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সন্ধ্যার পর দল দুটিকে বের করা হয় কক্ষ থেকে। সারাদিন ভয় ও উৎকণ্ঠায় থাকা মানুষগুলোকে দাঁড় করানো হয় সারি বেধে। মুহূর্তেই চারপাশ ভারী হয়ে যায় গুলির শব্দে। ৩৩টি নিথর দেহ একে একে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। লাশগুলো ফেলে চলে যায় হায়নার দল। এদিকে ওই গণহত্যার কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে মনোরঞ্জনের, শরীরের ওপর চাপ অনুভব করেন। বুঝতে পারেন তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। খানিক পর বুঝতে পারেন, লাশের স্তুপের নিচে তিনি। ৩২টি লাশের মাঝে একা বেঁচে আছেন মনোরঞ্জন। তখনও দুহাত বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে। ক্লান্ত শরীরে দাঁত দিয়ে বাঁধন কেটে হাত আলগা করেন তিনি। এরপর খোলেন চোখ। মৃত্যুর দুয়ার থেকে বেঁচে ফেরাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। সত্যিই বেঁচে আছেন কি না পরখ করতে নিজের শরীরে চিমটি কাটেন। এবার বিশ্বাস হয়। তিনি জীবিত আছেন। হঠাৎ পায়ে গরম কিছু একটা অনুভব করেন তিনি। দেখতে পান, সদ্য ঝাঝরা হওয়া লাশের শরীর থেকে ঝরে পড়া টাটকা রক্ত লেগে আছে তার পায়ে। মুহূর্তেই মৃত্যুপুরী ত্যাগ করার কথা মাথায় আসে তার। উঠতে গিয়ে নিজেকে একটি গর্তের ভেতর আবিষ্কার করেন তিনি; তাকেও মৃত ভেবে লাশের স্তুপে ফেলা দেওয়া হয়েছে। গর্ত থেকে উঠতে হবে। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সারাদিনের না খাওয়া শরীর আর চলছিল না। অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে দুহাতে ভর করে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। গীর্জায় তখন ভোরের ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। তবে জমাট বাধা আঁধার ফুরায়নি।

বুঝতে চেষ্টা করছিলেন কোথায় আছেন তিনি। আবছা আলোতে দেখলেন, জগন্নাথ কলেজের সামনে কোর্ট বিল্ডিংয়ে যে বাগান সেখানেই রাখা হয়েছে তাদের। সে রাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর আর এক মুহূর্তও ঢাকায় থাকেননি তিনি। সোজা চলে যান নরসিংদী। নরসিংদী থেকে ময়মনসিংহ। সিদ্ধান্ত একটাই, ভারত যেতে হবে তাকে। ময়মনসিংহের কলমাকান্দা, জামালপুর, নেত্রকোনা হয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে। সেখান থেকে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে কলকাতা যান তিনি। কলকাতায় গিয়ে তিনি কিছুদিন আকাশবাণীতে গান পরিবেশন করেন। পরে ১৯৭১ সারের ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শুরুর দিন থেকে শব্দ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত এ বীর মুক্তিযোদ্ধা সেখানে কাজ চালিয়ে যান। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে মনোরঞ্জন ফিরে আসেন।

এক ভাই হারানোর কষ্ট বুকে চেপে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন। কে জানত ফিরে আরও একজনের মৃত্যু সংবাদ পাবেন। দেশে ফিরে জানতে পারেন, তার ছোট ভাই মদন ঘোষালকেও হত্যা করেছে খান সেনারা। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে দুই ভাই হারানোর শোক নিয়ে বেঁচে আছেন এই শব্দ সৈনিক। বয়ে বেড়ান মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার সেই ভয়াল স্মৃতি। যা আজও তাকে অশ্রুসিক্ত করে।

স্বনামধন্য এই যোদ্ধা ও গায়ক তার গান দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধই করেননি, করেছেন মুক্তিসেনাদের উজ্জীবিত। শত্রু কবলিত দেশকে মুক্ত করতে সংগীতকেই বেছে নিয়েছিলেন হাতিয়ার হিসেবে। তার এই ঋণ কোনোভাবে শোধ করা সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্র তাকে সম্মান জানিয়েছে। শিল্পকলায় অবদান রাখায় চলতি বছর এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভূষিত করা হয়েছে একুশে পদকে। এই পদক, এই সম্মাননা হয়ত মুছে দিতে পারবে না এই বীরযোদ্ধার দুঃখ। মনোরঞ্জন ঘোষাল বর্তমানে দৈনিক ভোরের আকাশ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মানবিক হৃদয়ের মানুষ মনোরঞ্জন ঘোষাল জীবনের সোনালি সময়ে দেশের জন্য কাজ করেছেন। হারিয়েছেন স্বজন। মৃত্যুর পরও যেন মানুষের কল্যাণে আসেন সেজন্য মরণোত্তর দেহ দান করেছেন।